ভালোবাসা, ত্যাগ ও শ্রদ্ধার অনন্য দিন বাবা দিবস

মানুষের জীবনে বাবার ভূমিকা অনেক সময় নীরব, অথচ অত্যন্ত গভীর। সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য একজন বাবা সারাজীবন পরিশ্রম করেন, দায়িত্ব পালন করেন এবং নিজের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে সন্তানের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, ত্যাগ ও অবদানকে স্মরণ করার জন্যই বিশ্বজুড়ে পালিত হয় বাবা দিবস।

বাবা দিবসের ইতিহাস আমাদের নিয়ে যায় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের স্পোকেন শহরের এক নারী, সোনোরা স্মার্ট ডড, এই দিবসটি চালু করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মা মারা যাওয়ার পর তাঁর বাবা উইলিয়াম জ্যাকসন স্মার্ট একাই ছয় সন্তানকে লালন-পালন করেছিলেন।

বাবার সেই আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের কথা মনে রেখে সোনোরা চেয়েছিলেন বাবাদের সম্মান জানানোর জন্য একটি বিশেষ দিন থাকুক।

১৯১০ সালের ১৯ জুন প্রথমবারের মতো স্পোকেন শহরে বাবা দিবস উদযাপিত হয়। ধীরে ধীরে এই উদ্যোগ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

তবে জাতীয় স্বীকৃতি পেতে সময় লেগেছিল অনেক বছর। অবশেষে ১৯৭২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন জুন মাসের তৃতীয় রোববারকে জাতীয় বাবা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

বর্তমানে বিশ্বের বহু দেশে জুন মাসের তৃতীয় রোববার বাবা দিবস পালিত হয়। কোথাও সন্তানরা বাবাকে উপহার দেয়, কোথাও শুভেচ্ছা কার্ড পাঠায়, আবার কোথাও পরিবারের সবাই একত্রিত হয়ে বাবার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

তবে উপহার বা আয়োজনের চেয়ে বড় বিষয় হলো বাবার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসার অনুভূতি প্রকাশ করা।

আমাদের সমাজে বাবারা অনেক সময় নিজেদের আবেগ প্রকাশ করেন না। তাঁরা নীরবে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন, সন্তানদের

নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে নিরলস পরিশ্রম করেন।

তাই বাবা দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিক দিবস নয়; এটি বাবার অবদানকে নতুন করে উপলব্ধি করার একটি সুযোগ।

বাবা হলেন পরিবারের বটবৃক্ষের মতো, যার ছায়ায় সন্তানরা নিরাপদে বেড়ে ওঠে। তাঁর কঠোরতা সন্তানের শৃঙ্খলা শেখায়, তাঁর পরামর্শ জীবনের পথ দেখায় এবং তাঁর ভালোবাসা আত্মবিশ্বাস জোগায়।

তাই বাবা দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—জীবনের প্রতিটি সাফল্যের পেছনে একজন বাবার নীরব ত্যাগ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা জড়িয়ে থাকে।

বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনের প্রয়োজন না হলেও, বাবা দিবস সেই অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করার একটি সুন্দর উপলক্ষ।

এই দিনটি আমাদের শেখায়, যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন, বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে কখনো কার্পণ্য করা উচিত নয়। পৃথিবীর সব মানুষ খারাপ হতে পারে। তবে কোন বাবাই খারাপ না। পৃথিবীর সব বাবাদের কুর্ণিশ।

২২ বছরের পথচলায় বই, স্যালাইন আর ভালোবাসা

কুষ্টিয়ার ব্যস্ত শহর কিংবা নিরিবিলি গ্রাম—যেখানেই চোখ যায়, সেখানেই দেখা মেলে এক পরিচিত দৃশ্য। কাঁধে একটি ব্যাগ, ভেতরে স্বরবর্ণের বই আর খাবার স্যালাইন—এই নিয়েই নিরলস ছুটে চলেছেন কাজী সোহান শরীফ। টানা ২২ বছর ধরে তিনি হয়ে উঠেছেন পথশিশু, প্রতিবন্ধী ও অসহায় মানুষের এক নির্ভরতার নাম।
পথেই তার কর্ম, মানুষই তার প্রেরণা মানবসেবা তার কাছে কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেখানে অবহেলিত শিশু, যেখানে অসহায় মানুষ—সেখানেই উপস্থিত সোহান। কখনো বই দিয়ে শিশুদের হাতে তুলে দেন শিক্ষার আলো, আবার কখনো স্যালাইন দিয়ে লড়াই করেন জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে। তার এই পথচলায় নেই কোনো প্রচারণা, নেই প্রাপ্তির হিসাব। মানুষের হাসিই তার একমাত্র

প্রাপ্তি।
বই আর স্যালাইন—দুটি অস্ত্রেই লড়াই প্রতি বছরের শুরুতে নতুন বই নিয়ে পথশিশুদের মাঝে হাজির হন তিনি। অক্ষরজ্ঞানহীন শিশুদের হাতে তুলে দেন স্বরবর্ণের বই, খাতা-কলম। অন্যদিকে বছরের পুরো সময়জুড়েই চলে খাবার স্যালাইন বিতরণ, যা ডায়রিয়া প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
গরমে স্যালাইন, শীতে কম্বল, উৎসবে সেমাই-চিনি—প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন তিনি।
উদ্ভাবনী চিন্তায় এক ধাপ এগিয়ে মানবসেবার পাশাপাশি উদ্ভাবনেও নিজেকে আলাদা করে তুলেছেন সোহান। মশা নিধনের জন্য তৈরি করেছেন ফগার মেশিন। অন্ধদের জন্য বানিয়েছেন আল্ট্রা সেন্সর চশমা ও লাঠি, যা সামনে বাধা থাকলে সংকেত দিয়ে দুর্ঘটনা এড়াতে সাহায্য করে। মাত্র তিন মাসের প্রচেষ্টায়, ইউটিউব দেখে এবং নিজের মেধা কাজে লাগিয়ে এই প্রযুক্তি তৈরি করেছেন তিনি—স্বল্প খরচে, সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগে।
নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নীরব কাজ সমাজের লজ্জা ও সংকোচ ভেঙে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও কাজ করছেন সোহান। অনেকেই সরাসরি নিতে সংকোচ বোধ করায় তাদের মায়েদের মাধ্যমে পৌঁছে দেন স্যানিটারি ন্যাপকিন। পাশাপাশি জরায়ু ক্যানসার প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরির কাজও করে যাচ্ছেন।
সংগ্রাম থেকে উঠে আসা এক মানুষ খোকসা উপজেলার কালিবাড়ি এলাকায় জন্ম নেওয়া সোহানের শৈশব কেটেছে অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে। সেই কষ্টই তাকে শিখিয়েছে অন্যের কষ্ট বুঝতে। ১৮ বছর বীমা কোম্পানিতে চাকরির পর তিনি পেশা হিসেবে বেছে নেন প্রতিবন্ধীদের জন্য সার্জিক্যাল পণ্য তৈরি।
বর্তমানে কুষ্টিয়া শহরে নিজের ছোট পরিসরের কর্মস্থলে হুইলচেয়ার, কৃত্রিম হাত-পা তৈরি করেন। গরিবদের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তিনি কোনো লাভ নেন না।
প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে নীরবে। তার কাজের প্রভাব এখন দৃশ্যমান—
বহু পথশিশু প্রথমবারের মতো বই হাতে পেয়েছে। স্যালাইনের মাধ্যমে ডায়রিয়ার ঝুঁকি কমছে। প্রতিবন্ধীরা পাচ্ছে সহায়ক যন্ত্র
অন্ধদের জন্য প্রযুক্তি তৈরি নতুন সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। স্থানীয়দের কাছে তিনি এখন এক আস্থার নাম, এক মানবিকতার প্রতীক।
চ্যালেঞ্জ আছে, তবুও থামেননি। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা বা নিয়মিত অর্থায়ন ছাড়াই এই দীর্ঘ পথচলা সহজ নয়। তবুও থেমে থাকেননি সোহান। নিজের সীমিত সামর্থ্য নিয়েই এগিয়ে চলেছেন মানুষের পাশে থাকার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন
তার স্বপ্ন আরও বড়—
নিজের কাজকে একটি সংগঠনের মাধ্যমে বিস্তৃত করা, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা, আরও বেশি মানুষের কাছে

পৌঁছানো। এই লক্ষ্য পূরণে তিনি সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা কামনা করছেন।
কাজী সোহান শরীফ প্রমাণ করেছেন—মানবতার জন্য কাজ করতে বড় অর্থের প্রয়োজন নেই, দরকার বড় একটি মন। তার এই নিরলস পথচলা শুধু কুষ্টিয়ার গর্ব নয়, পুরো দেশের জন্যই এক অনুপ্রেরণার গল্প।

শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় সিক্ত গোলাম রসুল চির নিদ্রায়

মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে পৌর কবরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মরহুম গোলাম রসুল।

মঙ্গলবার বাদ আসর হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে পৌর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। জানাজায় সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাড মিয়াজান আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, মরহুমের ভাই লিজ্জু, ছেলে হাসান প্রমুখ।

এর আগে দুপুরে তাঁর মরদেহ মেহেরপুরে পৌঁছালে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। দীর্ঘদিনের সহকর্মী, আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের কান্নায় পুরো এলাকা শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

মঙ্গলবার ভোর ৩টার দিকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনসহ একাধিক মামলা দায়ের করা হয়। এরপর তিনি আত্মগোপনে চলে যান। সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মঙ্গলবার তাঁর একটি অপারেশন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সোমবার দিবাগত গভীর রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

গোলাম রসুল ছিলেন ব্যবসা সফল একজন উদ্যোক্তা। হোটেল বাজার থেকে তাঁর ব্যবসায়িক জীবনের সূচনা হয় এবং সেই ব্যবসায়িক গদি ঘর থেকেই শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা। কর্মীবান্ধব এই মানুষটি ছিলেন মেহেরপুরের আওয়ামী রাজনীতির এক জনপ্রিয় ও সফল নেতৃত্ব।

রাজনীতির ময়দানে তিনি ছিলেন অকুতোভয় ও সংগঠননির্ভর নেতা। দলের দুঃসময়ে তিনি মিছিলের অগ্রভাগে থেকে দলকে টিকিয়ে রেখেছিলেন দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে। এক পর্যায়ে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা হামলারও শিকার হতে হয়েছিল। মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের সোনালী অধ্যায়ে তাঁর নাম প্রেরণার প্রতীক হিসেবে উচ্চারিত হবে।

রাজনীতির পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যবসায়িক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুর বাস-মিনিবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, মেহেরপুর জেলা হজ সমিতির সভাপতি, মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম দায়িত্বশীল সদস্য এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মেহেরপুর ইউনিটের দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন মসজিদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

ভালোবাসা এখন ভার্চুয়াল—এটা কি সত্য সম্পর্ক?

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই প্রেম-ভালোবাসা শব্দ দুটো জড়িয়ে আছে আমাদের জীবনের সঙ্গে। ভালোবাসা-প্রেম, এখনো প্রকৃতির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও রহস্যময় আবেগ। প্রেম-ভালোবাসা ছাড়া কোনো মানুষই পরিপূর্ণ নয়। আজও মানুষের বেঁচে থাকার শেষ আশ্রয়স্থল হলো ভালোবাসা। মানুষ এই ভালোবাসার জন্যই বেঁচে থাকার শক্তি পায় আবার ভালোবাসা শূন্য হলে নিঃশেষ হয়ে যায়।

ভালোবাসার মানুষের জন্য বেদনা আর রক্তের অক্ষরে লেখা হতো চিঠি। রাত জেগে পরচোখের আড়ালে হৃদয় নিংড়ানো শব্দ ঝাঁপি খুলতো সন্তর্পণে। তারপর সেই চিঠি কাঙ্ক্ষিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া ছিল আরেক দুঃসাহসিক অভিযাত্রা।ভালোবাসার সম্পর্কে যা একে অপরের মধ্যকার সমুদ্র সমান দূরত্ব আর পর্বত সমান বাধাকে জয় করে জন্ম দিতো আত্মার এক বন্ধনের।আত্মার এ মিলন জন্ম জন্মান্তরের।এর বিনাশ নেই,হতে পারে না! আর তাই যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্ম হয় ভালোবাসার। ভালোবাসার মৃত্যু নেই,তার রয়েছে শুধু বিকাশ। ভালোবাসা সত্যিই অমর। সত্যিকারের ভালোবাসাই যে পৃথিবীতে সবচাইতে মূল্যবান, তা প্রমাণিত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দীতে।

ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস ও রাজা মেনেলাউসের স্ত্রী হেলেনের প্রেম কাহিনি পৃথিবীতে স্বরণীয় হয়ে থাকবে।ইতিহাসে মিশরীয় ফারাও ক্লিওপেট্রা আর মার্ক অ্যান্থনির নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাদের করুন প্রেম কাহিনি। দিল্লির প্রভাবশালী দম্পতি বাদশাহ শাহজাহান ও তার রানি মমতাজ। ভালোবাসার কাহিনী কারও অজানা নয়। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেম রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা যুগে যুগে মানুষের অন্তরে বসত করে।স্বর্গীয় প্রেম নামে আখ্যায়িত লাইলি-মজনুর প্রেম কাহিনী। তাদের সম্পর্ক এতটাই দৃঢ় ছিলো যে, মজনুকে আঘাত করলে আহত হতেন লাইলি নিজেই।প্রেমের জন্য এমন কত আত্মদানের নজির, সাহিত্যে অনুষঙ্গ।

একটা সময় ছিল যখন প্রেম বলতেই ছিল অন্তঃপুরের বিষয়। কাউকে ভালোবাসি বলাটাও ছিল পাপ। ‘হৃদয়ের কথা বলতে চাওয়ার ব্যাকুল’মন দহনে দহনে অঙ্গার হতো। বুক ফাটলেও মুখ ফুটতো না। জীবন প্রদীপ নিভে গেলেও প্রেম ছিল নিঃশেষিত।দেড় দশক আগেও প্রণয় এতোটা দুঃসাহসিক হয়ে উঠতে পারেনি। ভাঙতে পারেনি সামাজিকতার দেয়াল।

এখন সময় বদলে গেছে। পার্বতীর জন্য দেবদাসের দীর্ঘ অপেক্ষার যুগ শেষ হয়েছে । শিরি-ফরহাদের মতো অতৃপ্ত ভালোবাসার ইতিহাসও আর লেখা হবে না। প্রণয়-সঙ্গ এখন খুবই সহজ। চাইলেই প্রেম হয়! না চাইলেও হয়।আজকের যুগে ভালোবাসা এক ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তাচেতনা, জীবনযাত্রা ও প্রযুক্তির বিকাশ ভালোবাসার ধরনও বদলে দিয়েছে।

আগেকার দিনে ভালোবাসা ছিল অপেক্ষা, চিঠির আদান-প্রদান, একে অপরের জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করার মতো ধৈর্যের পরীক্ষা। কিন্তু বর্তমান যুগের ভালোবাসা অনেকটাই গতিময়, প্রযুক্তিনির্ভর

এবং বহুমাত্রিক।বর্তমান সময়ে প্রেম বা প্রণয় সম্পর্ক গড়া সহজ হলেও ভিত নড়বড়ে। বন্ধনও অতটা পোক্ত নয়। তাসের ঘরের মতো সম্পর্ক। এই আছে, এই নেই।আগে প্রিয় মানুষটির হৃদয়ের ধ্বনি তখন শোনা যেতো দূর থেকেও।বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ সেই দৃশ্যপট বদলে গেছে।বদলে গেছে প্রেমের মাধ্যমও। ফেসবুক,টুইটার,লিংকডইন,ম্যাসেঞ্জার,হোয়াটসআপ,ভাইবার,ইমো,স্নাপচ্যাট,জি-প্লাস,ইনস্ট্রাগ্রাম ইত্যাদি কত কিছু।এখন ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া যায় ইনবক্সের বার্তায়, ইমোজির হাসিতে, কিংবা হঠাৎ আসা নোটিফিকেশনে। সম্পর্ক শুরু হয় এক ক্লিকেই, আবার শেষও হয়ে যায় আরেক ক্লিকে। প্রশ্ন জাগে—এমন ভার্চুয়াল ভালোবাসা কি সত্যিকারের সম্পর্কের সমান?ভার্চুয়াল এই প্রণয় জগৎ ঠুনকো করে দিচ্ছে আন্তরিক সম্পর্ক।চাকচিক্য প্রিয় মানুষ, সুন্দরের পুজারি মানুষ বিশ্বাস হারাচ্ছে অন্তর্জালিক প্রতারণায়, যা বড় ধরনের বিপদও ডেকে আনছে সময়ে সময়ে।যোগাযোগ সহজ হওয়ায় মানুষের মনের টানও কমে আসছে।আগে প্রিয়তমা বা প্রিয়তমর দেখা পাওয়ার জন্য যে উত্তেজনা বা হৃদয়ের টান অনুভূত হতো মানবহৃদয়ে তা এখন নেই বললেই চলে।কারণ চাইলেই মুহূর্তে ভিডিও কলে রাখা যায় চোখে চোখ।

ভার্চুয়াল এই সাক্ষাতে কিছু ক্ষেত্রে প্রিয়জনকে কাছে টানা গেলেও আত্মিক বন্ধন নেই বললেই চলে।একটা উদাহরণ দিলে তা কিছুটা স্পষ্ট হবে।আমরা যখন কারও সঙ্গে সামনা সামনি কথা বলি, তখন দুজনই দুজনের প্রতি মনোযোগী হই।তখন কথাবার্তা বা চিন্তাভাবনায় তৃতীয় কেউ আসতে পারে না।কিন্তু আমরা যখন ম্যাসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলি, তখন একই সময়ে একাধিক জনের সঙ্গে আলাপ হয়।তখন আর মনোযোগ একমুখী থাকে না।একই সময়ে চিন্তাশক্তি এবং মনোযোগও ভাগ হয়ে যায়।এতে আলাপের গুরুত্বও অনেক ক্ষেত্রে কমে আসে ।কারও কারও জীবনে এই ভার্চুয়াল প্রেমই পরিণত হয়েছে স্থায়ী দাম্পত্যে। তাই প্রযুক্তি যেমন দূরত্ব কমিয়েছে, তেমনি ভালোবাসার নতুন এক অধ্যায় তৈরি করেছে।কিন্তু এই ভালোবাসার ভেতরেই লুকিয়ে আছে ভঙ্গুরতা। বাস্তবে দেখা না হওয়ায় অনেক সম্পর্ক দাঁড়িয়ে থাকে কেবল কল্পনার ওপর। সোশ্যাল মিডিয়ায় সাজানো হাসি, এডিট করা ছবি আর অল্প কিছু কথোপকথন দিয়েই তৈরি হয় এক পৃথিবী। অথচ বাস্তবে সেই পৃথিবী হয়তো একেবারেই আলাদা। তাই সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতেই সম্পর্ক ভেঙে যায়, এক নিমিষে হয়ে যায় ব্লক কিংবা আনফ্রেন্ড।এই ধরনের ভার্চুয়াল সম্পর্ক খুব বেশি দৃঢ় হয় না।দীর্ঘদিন একসঙ্গে পথচলাও সম্ভব হয় না.তরুণ প্রজন্মের অনেকেই ভার্চুয়াল ভালোবাসাকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। পড়াশোনা, পরিবার কিংবা নিজের

ভবিষ্যতের চেয়েও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে সেই সম্পর্ক। আবার এমনও আছে যারা কেবল সময় কাটানোর জন্য সম্পর্ক গড়ে তোলে, আর অন্যজন ডুবে যায় মানসিক আঘাতে।

তাহলে কি ভার্চুয়াল ভালোবাসা মিথ্যে? আসলে ভালোবাসা মিথ্যে হয় না কখনো। মিথ্যে হয় মানুষ, যদি সেখানে না থাকে সততা, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা। ভালোবাসা যদি আন্তরিক হয়, তবে সেটা ভার্চুয়াল হোক বা বাস্তব—দুই জায়গাতেই সমান সত্য। শুধু ইমোজি পাঠালেই সম্পর্ক টেকে না; আবার দেখা না করেও হৃদয়ের গভীর টান তৈরি হতে পারে, যদি দুইজন মানুষ সত্যিই একে অপরকে গুরুত্ব দেয়।

আজকের এই ডিজিটাল যুগে ভালোবাসা হয়তো অনেকটাই ভার্চুয়াল হয়ে গেছে—এটাই সময়ের নিয়ম। কিন্তু শেষ প্রশ্নটা আমাদের সবার জন্য রয়ে গেল—আমরা কি সত্যিই ভালোবাসছি, নাকি কেবল স্ক্রিনের আলোয় তৈরি করছি এক ক্ষণস্থায়ী মরীচিকা?

লেখক: কবি ও উদ্যোক্তা।

অকৃত্রিম ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার প্রয়াত আব্দুর রশিদ ও আবুল কাশেম স্যার

ফেসবুকের নীল পর্দা স্ক্রল করতে করতে হঠাৎ চোখ আটকে গেল। নিউজফিডে ভেসে উঠলো দুটি পরিচিত মুখ—আমাদের প্রিয়, শ্রদ্ধেয়, এখন আর না-ফেরা মানুষ—প্রয়াত আব্দুর রশিদ স্যার এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম স্যার। যেন সময় এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। ছবিগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে স্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে ফিরে এল বহু বছরের জমে থাকা মধুর সময়গুলো।

এই দুই গুণী মানুষের সাথে আমার সম্পর্ক শুধু পরিচয়ের গণ্ডিতে আটকে ছিল না—ছিল একসাথে হাসি, গল্প, আড্ডা আর অসংখ্য অমূল্য মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়ার সৌভাগ্য। আজ সেই অমলিন স্মৃতির কিছু

খণ্ডচিত্র তুলে ধরতে বসেছি।

স্মৃতির পথে পথে
গাংনী উপজেলায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের আয়োজনে “কমিউনিটি ফিলানথ্রপি” কর্মসূচি ছিল আমাদের মিলনমেলা। দুই মাস অন্তর আমরা যেতাম যশোর আরআরএফ ট্রেনিং সেন্টারে—কখনো ট্রেনে, কখনো বাসে, কখনো মাইক্রোতে। পথে ক্লান্তি বলে কিছু ছিল না।

মাইক্রোবাস ভর্তি প্রাণবন্ত মুখগুলো লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন স্যার, করমদি ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, মানিকদিয়া গ্রামের বীরমুক্তিযোদ্ধা ও কবি মোজাম্মেল হক, রাজনীতিক লাইলা আরজুমান বানু আপা, মনিরুজ্জামান আতু ভাই, আর দুই প্রিয় সঙ্গী—আবদুর রশিদ স্যার ও আবুল কাশেম স্যার।

যাত্রাপথ মানেই ছিল হাসি, ঠাট্টা আর গল্পে ভরা এক উৎসব। পল্টু স্যারের রসিকতা, জাকির স্যারের মজার উপমা, কাশেম স্যারের তীক্ষ্ণ জবাব—সব মিলিয়ে সময় যেন উড়ে যেত। আর এইসব প্রাণোচ্ছ্বল মুহূর্তের মাঝেই আব্দুর রশিদ স্যার থাকতেন নীরব শ্রোতা। মাঝেমধ্যে হাসির গল্পের পুনরাবৃত্তি চাইতেন, আর বাকিদের উল্লাস দেখে মৃদু হেসে চুপচাপ থাকতেন। তার নীরবতাতেও ছিল এক ধরনের উষ্ণতা।

**আব্দুর রশিদ স্যার ছিলেন—হিসেবী, প্রতিবাদী, সৎ, অনুসন্ধিৎসু, সময়ানুবর্তী ও অত্যন্ত সৎ মানুষ। দেনাপাওনার হিসাব সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে ফেলতেন। তার পোশাক-পরিচ্ছদে ছিল নিজস্ব আভিজাত্য—পাঞ্জাবি-পাজামা, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। শুনেছি, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—তার স্টাইলেও ছিল সেই ছাপ।

ফেসবুকে তার পোস্টগুলো কখনো কবিতার মতো কোমল, কখনো রাজনৈতিক প্রবন্ধের মতো তীক্ষè। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক কণ্ঠস্বর ছিলেন তিনি। এজন্য সমালোচনা, এমনকি হুমকিও সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু সত্য বলার সাহস কখনো হারাননি।

তিনি প্রযুক্তির সাথেও ছিল ভীষণ সখ্য। অ্যান্ড্রয়েড ফোনে সাহিত্যকর্ম লিখতেন, নতুন কোনো অপশন বা যুক্তাক্ষর লিখতে না পারলে ফোন দিতেন—“ভাই, এটা কিভাবে করবো?”
ঢাকার দেয়াল বনাম গ্রামের মুক্ত বাতাস :

ঢাকায় থাকার সময় ফোন করে বলতেন—
“ছোট ভাই, এই চার দেয়ালের মধ্যে ভালো লাগে না।”
আমি মজা করে বলতাম—
“স্যার, আপনি শহরের কোলাহল ছেড়ে চলে আসেন গ্রামীণ মুক্ত বাতাসে। যেখানে ধানের শীষ দোলে, পাখি গান গায়, খালের পানি ছুটে চলেৃ” তিনি মুচকি হেসে বলতেন—
“আমার তাপুর মেয়েটার জন্য থাকতে হচ্ছে। ওকে দেখবে কে?”আমার লেখার পাঠক :
আমি যখন কোনো গান বা কবিতা ফেসবুকে দিতাম, তিনি সবার আগে পড়তেন এবং প্রশংসা করতেন—হয়তো উৎসাহ দেওয়ার জন্যই। একদিন বলেছিলাম— “স্যার, আপনার লেখা বই আকারে বের করুন।”
তিনি রাজি হয়েছিলেন। পরে অগ্নি যুগের অগ্নি সেনা প্রকাশ করলেন । দুর্ভাগ্যবশত, সেই প্রকাশনা উৎসবে আমার থাকা হয়নি—সেই আফসোস আজও রয়ে গেছে।
শেষ কথা
আজ শুধু আব্দুর রশিদ স্যার নয়, আবুল কাশেম স্যার, সিরাজুল ইসলাম স্যার, মোজাম্মেল হক আঙ্কেল, জাকির স্যার, পল্টু স্যার—সবাই আমার জীবনে কখনো বাবার মতো, কখনো বন্ধুর মতো, কখনো অভিভাবকের মতো ভালোবাসা দিয়ে গেছেন।
যারা বেঁচে আছেন—তাদের জন্য সুস্থতা ও দীর্ঘায়ূ কামনা করছি। আর যারা চলে গেছেন তাদের জন্য দোয়া করছি, আমিন।
(অসমাপ্ত স্মৃতিচারণ)